শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

ছয় আনা

আদ্যিকালের ষষ্ঠীবুড়ীর ছেঁড়া ঝুলির মাঝে

নিত্য সাঁঝে সোনার নুপূর ঝামুর-ঝুমুর বাজে !

আয় খোকা আয় খুকী,—মোদের বুলবুলি আর টুনু,—

তোদের পায়ের নুপূরও আজ বা[illegible] রুনুঝুনু !

—১—

এক মালী আর তার বৌ ঘরে ছেলেপিলে নেই, সেই দুঃখেই দু-জনে মন-মরা।

মালী ফুল-বাগানের ফুল তোলে। মালীবৌ এ-বাড়ী ও-বাড়ী ফুল জোগায়। ফুলের জোগান দিতে গিয়ে মালীবৌ পথে এর-ওর ছেলেপিলে দ্যাখে আর মনে মনে ভাবে—'আমারও যদি অমন একটী ছেলে থাকৃত!' মালীবৌ মনের কথা মালীকে বলে। মালীও মনে মনে ভাবে—'বটেই তো!'……কিন্তু তাদের এ মনের কথা বোঝেই বা কে, আর তা বলেই বা কাকে!

একদিন মালীবৌ এ-বাড়ী ও-বাড়ী ফুলের জোগান দিয়ে ফিরে আস্‌ছে, ফুল-বাগানের সাম্‌নে আস্‌তেই দ্যাখে—চড়ুই-পাখীর মুখে দুধের মত শাদা-ধব্‌ধবে একটা প্রজাপতি। চড়ুই-পাখীর ঠোঁটের দু-পাশে প্রজাপতির পাখা-দুখানি থরথর ক'রে কাঁপ্‌ছে—যেন হাওয়ায় দোলা গন্ধরাজের দুটী পাপড়ি! দেখে মালীবৌ—'আহা রে!'—ব'লে ছুটে গেল। চড়ুই-পাখী আচমকা তাড়া খেয়ে মুখের শিকার মাটিতে ফেলে পালিয়ে গেল। মালীবৌ প্রজাপতিটীকে হাতের তেলোয় তুলে নিয়ে ঘরে এল।

মালীর ঘরে এসে প্রজাপতি মাথা নেড়ে জেগে উঠ্‌ল। তারপরই ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে মালীবৌর কানের গোড়ায় গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। বলো, আমি তোমার কি কর্‌তে পারি।'

কানের গোড়ায় প্রজাপতি কথা কয়, আবার সে কি কর্‌তে পারে জিজ্ঞেস করে! এ কি ব্যাপার!—মালীবৌ অবাক্‌ হ'য়ে বল্‌ল—'তুমি হ'লে প্রজাপতি,—তুমি আবার আমার কি কর্‌বে?'

প্রজাপতি বল্‌ল—'আমি প্রজাপতি নই,—আমি ফুলপরী। ফুল-বাগানে থাকি। দিনের বেলায় আমাদের বের হ'তে নেই। আজ ভোরবেলা ফুলের গন্ধ শুঁক্‌তে বের হ'য়েছিলেম, তাতেই চড়ুই-পাখীর মুখে প'ড়ে বিপদ ঘটেছিল। তুমি এসে আমার প্রাণ

কানের গোড়ায় প্রজাপতি কথা কয়,...এ কি ব্যাপার !—৪ পৃষ্ঠা

বাঁচালে। তোমার জন্যে কিছু করব—সে আর বেশি কি!—বলো, তুমি কি চাও।'

ফুলপরীরা সত্যিই ফুল-বাগানে থাকে, আর দুধের মতই তাদের শাদা-ধবধবে রং, তার উপর তারা যা-খুশী করতেও পারে—মালীবৌ ছোটকাল হ'তেই শুনে আসছে। সেই ফুলপরী তার জন্যে কিছু করতে চায়—মনের সাধ জানাবার এমন সুযোগ আর হবে কবে! ফুলপরীর পরিচয় পেয়েই তাই সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'তুমি আমার কিছু করতে চাও তো করো,—যেন আমি ছেলে কোলে পাই।'

ফুলপরী বলল—'বেশ। ফুল-বাগান থেকে একটা টাটকা ফুল তুলে আনো দেখি।'

ফুলপরীর কথায় মালীবৌ ফুল-বাগানে ছুটে গেল। সেখানে চোখের সামনে আর-কোনো টাটকা ফুল না পেয়ে যুঁইফুলের গাছ থেকে তাড়াতাড়ি একটা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে এল।

ফুলপরী যুঁইফুলের কুঁড়িটার উপর খানিকক্ষণ মুখ বুলাতে লাগল। তারপর মালীবৌকে বলল—'নাও, এবার এ ফুলটা খেয়ে ফেলো। এতেই তোমার ছেলে হবে। কিন্তু একেই যুঁইফুল, তাতে আবার তার কুঁড়ি,—ছেলেটা হবে কিন্তু নেহাৎ ছোট্ট।'

ছোট্ট হোক্ আর বড় হোক্—ছেলে তো! ছেলের আশায়

মালীবৌর আর-কিছুরই খেয়াল রইলো না। সে যূঁইফুলের কুঁড়িটীকে তাড়াতাড়ি মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌ল।

... ...

দশ-মাস দশ-দিন পরে মালীবৌর সত্যিই এক ছেলে হ'লো, আর সে ছেলে দেখ্‌তেও হ'লো সত্যিই নেহাৎ ছোট্ট—যেন টিকটিকির ছানাটী! দু-আঙ্গুল এ ছেলেকেই পেয়ে মালী আর মালীবৌ আহ্লাদে আটখানা!

—২—

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যায়,—মালীর ঘরে মালীর ছেলে দিনে দিনে বড় হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু বড় হ'য়েও দু-আঙ্গুলের উপর দু-আঙ্গুল বেড়ে তার আর বাড়তি নেই—টাক্কুর মেরে সে চার-আঙ্গুলে বাঁটুল হ'য়েই রইলো।

চার-আঙ্গুল ছেলেটী—বিক্রমে তার বাপ-মা অস্থির। মা-বাপের সঙ্গে আড়ি ক'রে দুর্ব্বাঘাসের মধ্যে সে লুকিয়ে থাকে,—টু ক'রে নিজে ধরা না দিলে সেখান থেকে তাকে খুঁজে পায় কার সাধ্য! খাবার-টাবারের ভাণ্ড চোখে পড়্‌লে চুপি চুপি তারই মধ্যে লুকিয়ে থেকে দু-হাতে খাবার সাবাড় করে,—কে তাকে তখন ছ্যাখে!

একদিন মালীর ঘরে তালপিঠে হবে, মালীবৌ তালের

গোলা গুলে বাটিতে রেখে বাইরে গিয়েছে, চার-আঙ্গুলে বাঁটুল ঘরে এসে সেই গোলা দেখে নেচে উঠল্। বাটির ভেতর হ'তে তালের গোলা তুলে খাবে ভেবে যাই সে তার কাঁধার উপর ঝুঁকেছে, অম্‌নি ডিগ্‌বাজি খেয়ে চিৎপাত হ'য়ে বাটির মধ্যে প'ড়ে গেল। তখন তার উঠারও সাধ্যি নেই, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই—বাটির মধ্যে প'ড়ে শুধু হাত-পা ছড়াতে লাগ্‌ল। মালীবৌ ফিরে এসে ত্যাখে—সর্ব্বনাশ! বাটির ভেতর হ'তে তাড়াতাড়ি ছেলেকে টেনে তুলে সে যাত্রা তার প্রাণরক্ষার উপায় হ'লো।

এরপর বাঁটুলকে চোখে চোখে রাখারও দরকার। কিন্তু কেউকে দিনরাত আগ্‌লানোও কি সোজা! চার-আঙ্গুল ছেলেটা—বেড়াল দেখ্‌লে ইঁদুর-ছানা ভেবে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, চিল-শকুন দেখ্‌তে পেলে উড়ে এসে ছোঁ মারে—এ-ও তো এক মুস্কিল!

একদিন মালী ফুল-বাগানে কাজ কর্‌ছে আর চার-আঙ্গুলে বাঁটুল তার কাছে ব'সে আছে, হঠাৎ শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে এসে একটা চিল ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে গেল। মালী লাফিয়ে উঠে হেঁই হেঁই ক'রে চিলের পেছন পেছন ছুটে গেল। কিন্তু আকাশের পাখীকে ধরে কে?—বাঁটুলকে মুখে ক'রে নিয়ে চিল আকাশে উড়ে গেল।

চিল চার-আঙ্গুলে বাঁটুলকে ইঁদুর-ছানা ভেবে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিকার খেতে গিয়ে দ্যাখে—বিপদ! নদীর পারে বটগাছের ডালে চিলের বাসা। চিল উড়ে বাসায় গিয়ে যেম্‌নি বসেছে, অমনি বাঁটুল দু-হাতের দশ-আঙ্গুলে তার গলা টিপে ধর্‌ল। মুখের গ্রাস ছেড়ে দিয়ে চিল তখন চ্যাঁ চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে অস্থির। সঙ্গে সঙ্গে চার-আঙ্গুলে বাঁটুলও টুপ্‌ ক'রে নদীতে প'ড়ে গেল।

নদীর জলে তখন এক রাঘব-বোয়াল সাঁত্‌রে যাচ্ছিল। বাঁটুল নদীর মধ্যে তার মুখের কাছে পড়্‌ল। রাঘব-বোয়াল বাঁটুলকে কাম্‌ড়ে ধ'রে গপ ক'রে গিলে ফেল্‌ল।

রাজবাড়ীর জেলে রোজ নদীতে মাছ ধরে, আর সেই মাছ রাজবাড়ীতে জোগায়। এ-দিন নদীতে মাছ ধর্‌তে গিয়ে তার জালে পড়্‌ল রাঘব-বোয়াল। জেলে সেই রাঘব-বোয়াল রাজবাড়ীতে দিয়ে এল।

রাজবাড়ীর রসুইঘরের বুড়ী বাঁদী রাঘব-বোয়াল কাট্‌তে গিয়ে দ্যাখে—তার পেটের মধ্যে টিকটিকির মত একটী জ্যান্ত মানুষ! তখনই রাজবাড়ীতে হৈ হৈ প'ড়ে গেল। খবর পেয়ে রাজা-রাণী ছুটে এলেন। চার-আঙ্গুলে বাঁটুলকে দেখে তাঁরা অবাক্‌! এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে?—রাজা-রাণী আদর ক'রে বাঁটুলকে রাজপুরীতে ঠাঁই দিলেন।

—৩—

এদিকে মালী আর মালীবৌ ছেলের জন্যে কেঁদেকেটে অস্থির। ছেলের খোঁজে তারা দেশবিদেশে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে চার-আঙ্গুলে বাঁটুল যে-রাজার রাজ্যে রয়েছে সেখানে এসে

রাজা-রাণী···চার-আঙ্গুলে বাঁটুলকে দেখে···অবাক্ !—৯ পৃষ্ঠা

উপস্থিত। আর সেখানে এসে তারা রাজার মালীর ঘরে অতিথি হ'লো।

রাজার মালী রোজ রাজবাড়ীতে যায়। চার-আঙ্গুলে বাঁটুলকে সে রোজই দ্যাখে। মালী আর মালীবৌর কাছে সকল কথা শুনে সে বাঁটুলের খোঁজ ব'লে দিল। ছেলেকে দেখার জন্য তখন মালী আর মালীবৌকে থামিয়ে রাখা দায়।

কিন্তু রাজবাড়ীতে গিয়ে ছেলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলাও তো সহজ নয়। মালী রাজার মালীকে ধ'রে পড়্‌ল—যা হোক্ একটা উপায় তাকেই ক'রে দিতে হবে।

রাজার মালী রোজ রাজবাড়ীতে যায়, আর ওৎ পেতে থাকে কখন বাঁটুলকে একলা পায়। একদিন হঠাৎ তাকে একলা পেয়ে খপ্ ক'রে হাতের মুঠায় ধ'রে বাড়ীতে নিয়ে এল। সেখানে এসে বাঁটুল বাপ-মাকে দেখ্‌তে পেয়ে মহাখুশী।

অনেকদিন পরে বাপ-মায়ের সঙ্গে বাঁটুলের দেখা—কথায় কথায় রাত্রি হ'য়ে গেল। তখন সকলেরই ভাব্‌না হলো—কি ক'রে বাঁটুল রাজবাড়ীতে ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীর দেউড়ি বন্ধ হ'য়ে যায়; তারপর দরজা দিয়ে কাক-প্রাণীরও ঢোকার উপায় থাকে না। তার উপর যেভাবে বাঁটুলকে আনা হয়েছে, রাজা টের পেলে রাজার মালীর গর্দ্দান থাক্‌বে না।

রাজার মালী আর বিদেশী মালী দু-মালীতে মিলে যুক্তি কর্‌তে লাগ্‌ল। যুক্তি ক'রে তারা খানিকটে সুপারির বাকৃড়া জোগাড় ক'রে আন্‌ল, আর তার খানিকটে পাতলা পর্দ্দা তুলে একটা ফানুস

তৈরী কর্‌ল। সেই ফানুসে বাঁটুলকে চড়িয়ে রাজবাড়ীর দেয়ালের কাছে গিয়ে দুজনে গাল ফুলিয়ে ফুঁ-এর পর ফুঁ দিতে লাগ্‌ল। দুজনের ফুঁয়ের হাওয়ায় ফানুসশুদ্ধ বাঁটুল হুস্‌ ক'রে উপরে উঠে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে রাজবাড়ীর ভেতরে গিয়ে পড়্‌ল।

সারাদিনের পাহারা সেরে রাজার কোটাল সবে খাটিয়া পেতে দেয়ালের পাশে জিরোতে বসেছেন, ফানুসশুদ্ধ বাঁটুল—পড়্‌ তো পড়্‌—হুড়মুড় ক'রে কোটালের মাথার উপর গিয়ে পড়্‌ল। 'কে রে?'—ব'লে কোটাল লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তারপরই মাথায় হাত দিয়ে বাঁটুলকে পেয়ে চ'টে লাল!

কোটাল তক্ষুনি সেপাই-শান্ত্রীকে ডেকে হুকুম কর্‌লেন—'এত বড় আস্পর্দ্ধা এ বেয়াদবের!—কাল রাজাকে ব'লে গর্দ্দান নেওয়াব। এখন একে নিয়ে কয়েদ ক'রে রাখ।'

কিন্তু চার-আঙ্গুল তো মানুষ, তাকে কয়েদ করা যায় কোথায়? ভেবে ভেবে একজন সেপাই একটা ইঁদুরের কল এনে তার ভেতর বাঁটুলকে পূরে রাখ্‌ল।

—৪—

রাজকন্যার পোষা বেড়াল—রাজকন্যার সঙ্গে ব'সে রোজ দুধভাত খায়, তারপর পাড়া-বেড়াতে যায়। আজ কয়েদখানার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বেড়াল ছ্যাখে—একটা ইঁদুরের কল, আর তার

মধ্যে ইঁদুরের মত নড়ে কি! দেখে বেড়ালের পেটের খিদে চেগে উঠ্‌ল। ইঁদুরের কলের উপর সে জোরে জোরে কয়েকটা থাবা মার্‌তেই কলের জাল ছিঁড়ে গেল, আর তার মধ্য হ'তে বের হ'য়ে এল—চার-আঙ্গুলে বাঁটুল। ইঁদুরের বদলে মানুষ দেখে বেড়াল তখন এক-পা দু-পা ক'রে পিছিয়ে দে-ছুট্‌!

কিন্তু বেড়ালের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েও বাঁটুলের হ'লো মুস্কিল। কারু নজরে পড়্‌লে রক্ষা নেই; তার উপর কোটাল শাসিয়ে রেখেছেন—ভোর হ'লেই রাজার বিচারে গর্দ্দান যাবে। এখন সে যায় কোথায়?

রাজবাড়ীর পুরুতঠাকুর রাজবাড়ীর ভেতরেই থাকেন। তিনি রোজ ভোরবেলা কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান। কমণ্ডলুতে ভ'রে যে-গঙ্গাজল আনেন তা দিয়ে পূজাআচ্চা ক'রে খালি কমণ্ডলুটী ঠাকুরঘরেই রেখে দেন। ভেবেচিন্তে বাঁটুল ঠাকুরঘরে গিয়ে পুরুতঠাকুরের কমণ্ডলুটীর মধ্যে শুয়ে রইলো।

নিত্যকার মত সেদিনও পুরুতঠাকুর কমণ্ডলু নিয়ে গঙ্গাস্নানে গেলেন। তারপর কমণ্ডলুটী ঘাটে রেখে জলে নাম্‌লেন। বাঁটুল তখন কমণ্ডলু হ'তে বেরিয়ে পড়্‌ল। আর ঘাটের পাশে একটা কাঁকড়ার গর্ত্ত দেখে তার মধ্যে লুকিয়ে রইলো।

ঘাটে যখন লোকজন থাকে না তখন এক শেয়াল কাঁকড়া খেতে নদীর পারে আসে। আর সেখানে এসে কাঁকড়ার গর্ত্তে

লেজ ঢুকিয়ে ব'সে থাকে। কাঁকড়া দাড়া দিয়ে তার লেজ যেম্‌নি আঁকড়ে ধরে, শেয়াল অম্‌নি একটানে লেজটাকে গর্ত্তের বাইরে তোলে, তারপর কাঁকড়া ধ'রে মেরে খায়। এ-দিনও কাঁকড়ার লোভে শেয়াল নদীর পারে এসে কাঁকড়ার গর্ত্তে লেজ ঢুকিয়ে দিল। বাঁটুল শেয়ালের লেজ সাম্‌নে দেখে দু-হাত দিয়ে তা টেনে ধর্‌ল।

লেজে শিকার বেধেছে মনে করে শেয়াল একটানে লেজটা গর্ত্ত হ'তে টেনে তুল্‌ল। কিন্তু লেজের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে—কাঁকড়া তো নয়, কি-এক জানোয়ার তার লেজ ধ'রে ঝুল্‌ছে! মানুষের মত মুখ, মানুষের মত হাত-পা—হুবহু মানুষই! হোক্‌ না চার-আঙুল লম্বা,—মানুষকে ভয় না করে কে? মানুষ দেখে শেয়ালও ভয়ে ভয়ে লেজ গুটিয়ে দৌড় দিল।

দৌড়াতে দৌড়াতে শেয়াল বন-বাদার পেরিয়ে নলখাগড়া-ঝোপের পাশে তার বাসায় গিয়ে হাজির। বাঁটুল তখনও দু-হাতে তার লেজ ধরে ঝুল্‌ছে। নলখাগড়া-ঝোপের মধ্যে লম্বা লম্বা ঠ্যাংও'লা কাবলী-মশা দেখে সে শেয়ালের লেজ ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিড়িং করে লাফ মেরে একটা মশার পিঠে চ'ড়ে বস্‌ল।

কাবলী-মশা দিনের বেলা ঝোপ-জঙ্গলে থাকে, রাত্রি হ'লে রাজবাড়ীতে হাতী-ঘোড়ার রক্ত খেতে যায়। বাঁটুল যে-

মশার পিঠে চড়ে বস্‌ল, সেও সঙ্গীসাথী নিয়ে রাত্রিতে রাজবাড়ীতে হাতী-ঘোড়ার রক্ত খেতে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আর-আর মশারা সুড় সুড়্ ক'রে উড়ে নলখাগড়া-বনে এল। কিন্তু যে-মশার পিঠে বাঁটুল, পিঠের বোঝায় একেই

তিড়িং ক'রে লাফ মেরে···মশার পিঠে চ'ড়ে বস্‌ল।—১৪ পৃষ্ঠা

তার দম বন্ধ, তার উপর পেট-বোঝাই ক'রে রক্ত খেয়ে তার আর নড়াচড়ার উপায় রইলো না। কষ্টেস্‌ষ্টে উড়্‌তে উড়্‌তে সে রাজবাড়ীর পেছনে মালীর বাগানে এসে হাঁপিয়ে পড়্‌ল।

তখন সেই ফুল-বাগানের মধ্যে একটা ফুলগাছের আড়ালে সে হাত-পা এলিয়ে প'ড়ে রইলো।

—৫—

ভোরবেলা রাজার মালী ফুল তুল্‌তে ফুল-বাগানে এসেছে। মালী এ-ফুল তোলে ও-ফুল তোলে, একটা ফুলগাছের কাছে যেতেই দ্যাখে—সেখানে চার-আঙ্গুলে বাঁটুল!

রাজার মালী তক্ষুনি ছুটে ঘরে গিয়ে বিদেশী মালীকে ডেকে আনল। সেও এসে বাঁটুলকে সেখানে দেখে অবাক্!

বাঁটুলের মুখে সকল কথা শুনে মালীর আর মালীবৌর সে রাজ্যে আর ছেলেকে রাখ্‌তে সাহস হ'লো না। বাঁটুলও গর্দ্দান যাবার ভয়ে অস্থির। রাজার মালী ফুলের চুবড়ির ভেতর চার-আঙ্গুলে বাঁটুলকে লুকিয়ে রাজ্যের সীমানা পার ক'রে দিয়ে এল। ছেলেকে নিয়ে মালী আর মালীবৌ ঘরে ফিরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

... ...

সেই হ'তে বাঁটুল মালীর ঘরেই আছে। এখন তার আশী বছর বয়স। কিন্তু এ বয়সেও তাকে দেখ্‌তে যে চার-আঙ্গুল সেই চার-আঙ্গুলে বাঁটুলই!

ঝণ্টুবাবু এখনও কি খোকনমণি আছে!
ভাবছ বুঝি 'তাই' দিলেই ধিন্‌তাধিনা নাচে!
বয়স হয়েছে কম হ'লেও তিনটী বছর পূরা,—
গোঁফদাড়িটা হ'লেই হ'তো দাদুর মত বুড়া!
তাতাতুয়া বলে না আর দেখ্‌লে কাকাতুয়া;
দিদিকে ভয় দেখায় ডেকে নিজেই হুক্কাহুয়া!

ঝণ্টুবাবু একলা পারে রেলগাড়ীতে উঠে
দিল্লী-লাহোর আস্‌তে ঘুরে একমিনিটে ছুটে!

শোবার ঘরে মেঝের পরে পেতে বাবার মোড়া,
হুস্ হুস্ ক'রে হ'য়ে যায় তার দিল্লী-লাহোর ঘোরা!
ঝণ্টুবাবু হয়নি বড়, এর পরে কে বল্‌বে?
শুন্‌লে কিন্তু দুধ তাকে আজ খাওয়ানো না চল্‌বে!

—১—

ভণ্ডুলের সঙ্গে আমার জানাশুনা মাসীমার বাড়ী গিয়ে। ভণ্ডুলের বাড়ী আর মাসীমার বাড়ী একই গ্রামে—এ-পাড়ায় আর ও-পাড়ায়। সেবার গরমের ছুটিতে মাসীমার বাড়ী গিয়েছিলুম; তখন একদিন পাড়ার ছেলেদের খেলা দেখ্‌তে গিয়ে খেলার মাঠে ভণ্ডুলের সঙ্গে আলাপ হয়। ভণ্ডুল বয়সে আমার অনেক ছোট। কিন্তু হ'লে কি হয়!—সেই একদিনের আলাপেই তার সঙ্গে যে-ভাব জ'মে গেল তাতে বয়সের খেয়াল কারু রইলো না।

ভণ্ডুল সেইদিনই নেমন্তন্ন ক'রে রাখ্‌ল—পরের দিন বিকেলে তাদের পাড়ায় যেতে হবে। পরদিন বেলা চারটে নাগাদ ভণ্ডুল নিজেই এসে উপস্থিত। মাসীমাকে ব'লে আমি ভণ্ডুলের সঙ্গে বেড়াতে চল্‌লুম।

পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথ, চারদিকে শুধু ঝোপঝাড় গাছপালা আর ডোবা। ভণ্ডুলদের পাড়াটী যেন গাছপালারই কেয়ারি। খানিকদূর গিয়ে নারকেলগাছ-ঘেরা ছোট্ট একটী পুকুরের পাড় দিয়ে চলেছি, পেছনে কাঁপা-গলার প্রশ্ন শুন্‌লুম—'কে রে?—নাত্‌জামাই নাকি?···সঙ্গে ওটী কে?'

কথা শুনে আমি ফিরে দাঁড়ালুম। চেয়ে দেখি—পুকুরের ঘাটে এক বুড়ো,—আধ্‌লা-চেরা আমের শুক্‌নো আম্‌সির মত কালো-কালো ঠোঁট দুখানি হাঁ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভণ্ডুল আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল। বল্‌ল—'চলুন শীগ্‌গির। ওদিকে আর তাকাতে হবে না।'

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমি জিজ্ঞেস কর্‌লুম—'বুড়োটী কে ও? ডাক্‌ছিলেনই বা কাকে?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'ও দাড়িমামা। আমাকেই ডাক্‌ছিলেন?'

—'দাড়িমামা!—দাড়িমামা কি হে?'

—'ও-ই ওর নাম।'

একটুখানি ভেবে আমি বল্‌লুম—'দাড়ি আর মামা, অর্থাৎ

দাড়িও'লা মামা,—বুঝেছি।...কিন্তু মামা কি হে?—শুন্‌লুম না, ডাক্‌লেন নাত্‌জামাই ব'লে?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'সবারই উনি মামা। আমি তো তবু তামাসার নাত্‌জামাই, ওর আসল নাত্‌জামাইরও মামা উনি।'

ভণ্ডুল আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল।—২০ পৃষ্ঠা

ভণ্ডুলের কথা শুনে আমি হেসে ফেল্‌লুম। বল্‌লুম—'ওঃ! সরকারী মামা বুঝি?'

ভণ্ডুল আর-একদিকে চেয়ে শুধু মাথা নাড়্‌ল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—'ভদ্দরলোক কি বল্‌লেন, তার জবাব না দিয়ে পালিয়ে এলে যে?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'ধ্যেৎ! ওর আবার জবাব দেবো কি! আর-একটু থাকলেই বুঝ্‌তেন—বুড়ো নাগাল পেলে গালে সুড়সুড়ি না দিয়ে ছাড়্‌তেন না!'

আমি ভণ্ডুলের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়্‌লুম। বল্‌লুম—'বলো কি হে? কোথায় ওর দাড়ি? মাথার বেহ্মতালু হ'তে থুৎনি পর্য্যন্ত সবখানেই যে হবিষ্যির মালসা। উনি আবার দাড়ির সুড়সুড়ি দেবেন কি?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'ঐটেই তো ওর বাতিক।'

—'আর ঐ-জন্যেই বুঝি ওর নাম দাড়িমামা?'

ভণ্ডুল ঠোঁট উল্‌টিয়ে জবাব দিল—'কে জানে অতশত! হয় তো দাড়িটাড়িও ছিল আগে।'

—'আর তারই জের এখনও চল্‌ছে! যেমন, না আছে পদ্ম, না আছে জল, পুকুরের নাম পদ্মপুকুর!'

—২—

ভণ্ডুলদের পাড়া বেড়িয়ে মাসীমার বাড়ী ফিরে এসে দাড়িমামার খবর কতেকটা পেলুম। দাড়িমামার ভাগ্নী ছিলেন গাঙ্গুলী-

বাড়ীর গিন্নি—গাঁয়ের দিদি-ঠাকুরুণ। গাঙ্গুলী-গিন্নির একূল ওকূল দুকূলই ছিল বাড়ন্ত। তাই মামাকে ভিটেয় বসিয়ে নিশ্চিন্দি-মনে তিনি চোখ বুজ্‌লেন। দিদি-ঠাকুরুণের খাতিরে গাঁয়ের লোকেরাও তাঁকে সরকারী মামার পদে বাহাল ক'রে নিলেন।

আমি বল্‌লুম—'এ তো হ'লো খাঁটী মামার মানে। দাড়ির মানেটা কি?'

মেসো-মশায় বল্‌লেন—'বরাবরই তো দেখে আস্‌ছি ঐ তালবেগুনী চোপা। ওতে যে কখনো দাড়িটাড়ি ছিল, মনে তো হয় না।'

আমার মনের খট্‌কা কিন্তু দূর হ'লো না। শুধু মামা হ'তো তার মানে ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে আবার দাড়ির ঠেকো কেন? বল্‌লুম—'নিশ্চয়ই কিছু মানে আছে।'

মাসীমা চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—'রেখে দে তোর মানে। গাঙ্গুলী-গিন্নি ডাকতেন দাড়িমামা, তাই গাঁয়ের লোকও ডাকে তাই। আর থাকলই বা মানে, তাতে কার কি?'

কার কিছুই নয় বটে, আমার মনের মধ্যে তবু সারারাত গজ্‌গজ্‌ করতে লাগ্‌ল…দাড়িমামা!…কেন? ভেবে ভেবে ঠিক করলুম—গয়লার কাছেই গোয়ালের খবর জানা ভালো। খোদ দাড়িমামার কাছেই দাড়ির খবর জানতে হবে।

—৩—

ভণ্ডুলদের পাড়ার পথে দু-চারবার আনাগোনা করতেই দাড়িমামার সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেল। ভণ্ডুল কেন যে বুড়োর কাছে ঘেঁস্‌তে চায় না তা-ও তখন বুঝ্‌লুম। বুড়ো মানুষ, গাঁয়ের একঠেঁয়ে একলা প'ড়ে থাকেন, হাঁটাচলারও তেমন শক্তি নেই, তাই সঙ্গীসাথী পেলে দু-দণ্ড কথা ব'লে বাঁচেন, আর ছেলে-ছোকরাদের দেখ্‌লে ডেকে নিয়ে গালে থুৎনি ঘ'ষে সুড়সুড়ি দিয়ে আদর করেন। ভণ্ডুল একেই ছট্‌ফটে, তার ওপর সুড়সুড়ি সওয়ার ছেলে নয়, তাই বুড়োকে দেখ্‌লেই ছুট্‌ মারে।

ভণ্ডুলের সুবাদে আমিও বুড়োর নাত্‌জামাই হ'য়ে পড়্‌লুম। ওটা তাঁর নেহাৎ সখের সম্পর্কেরই ডাক। তবু ও-ডাকে সাড়া দিয়ে বুড়োর গাছের ফল-পাকোরটার ভাগ রোজই মিল্‌তে লাগ্‌ল।

সত্যিই বুড়োর বাড়ীতে আম আর ডাবের অন্ত ছিল না। আমি সেই ফলারের লোভে রোজই সময়মত বুড়োর বাড়ীতে হাজ্‌রে দেই; বুড়োও গল্প-করার লোভে আমাকে ছাড়্‌তে চান না।

একদিন কথায় কথায় ব'লে ফেল্‌লুম—'দাড়িমামা, আপনার কি কখনো দাড়ি ছিল?'

বুড়ো চোখ-দুটো কুঁচ্‌কে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—'কেন রে, নাতজামাই?'

—'নইলে সবাই আপনাকে দাড়িমামা ডাকে কেন?'

ফোকলা-মুখে একগাল হেসে বুড়ো বল্‌লেন—'ওঃ!···কেন, দাড়ি থাকলে সুড়সুড়ি খেতে ভালো লাগ্‌ত বুঝি?'

আমি বল্‌লুম—'সেটা পরখ না ক'রেই বলি কি ক'রে!'

—'বেশ, এখনই তবে পরখ ক'রে নে'—ব'লেই আমার গালে তাঁর থুৎনি ঘ'ষে দিলেন। তারপর বল্‌লেন—'আরো বেশিতে সাধ থাকে তো, কাল একটু সকাল সকাল আসিস্।'

আমি বল্‌লুম—'আচ্ছা। ঠিক দুপুরবেলায়ই হাজ্‌রে দেবো। তখন কিন্তু আসল খবর না পাই তো দাড়িমামার দাড়ি ছিঁড়ে দেবো—ব'লে রাখ্‌ছি।'

বুড়ো আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট-দুখানি হাঁ ক'রে দুলে দুলে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

—৪—

পরের দিন খেয়েদেয়েই দাড়িমামার বাড়ীর দিকে ছুট্‌লুম। সেখানে গিয়ে উঠানে পা দিয়েই আমার চক্ষুস্থির!—কোথায় গেলেন দাড়িমামা?—আর তাঁর ঘরের দরজায়ই বা ব'সে কে ও?—মাথায় পাগ্‌ড়ী 'ঙ', আর গালে ইয়া-লম্বা কালো-মিস্‌মিসে কাব্‌লী দাড়ি! অবাক্ হ'য়ে উঠানেই আমি থম্‌কে দাঁড়ালুম। চমক ভাঙ্‌ল

কাঁপা-গলার আওয়াজ শুনে। ইয়া-লম্বা দাড়ি নেড়ে দাড়িমামাই ডাক্‌ছিলেন—'এসো, নাত্‌জামাই, এসো!'

এগিয়ে গিয়ে আমি বল্‌লুম—'এ কি?'

দাড়িমামা বল্‌লেন—'দাড়িমামার দাড়ি।'

—'বটে?'—আমি দাড়িমামার গা-ঘেঁসে ব'সে প'ড়ে তাঁর দাড়ি ধ'রে টান দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর থুৎনি থেকে তা আল্‌গা হ'য়ে খ'সে পড়্‌ল।

বুড়ো নিজেও তখন মাথার পাগ্‌ড়ীটা খুলে ফেল্‌লেন। বল্‌লেন—'কথা দিয়েছ, আজ বেশি করে সুড়সুড়িটা খাবে। আমি তাই দুপুর থেকেই সঙ্‌ সেজে ব'সে আছি। কিন্তু, ছ্যাঃ, গোড়ায়ই সব মাটি ক'রে দিলে! দাড়িটাই যদি মুখে না থাক্‌ল, তবে আর মাথায় পাগ্‌ড়ী রেখেই বা কি হবে! হাতীর সঙ্গে হাওদা, গাধার সঙ্গে বোচ্‌কা,—যার যাতে শোভা!'

আমি দাড়ির গোছা হাত দিয়ে মেপে বল্‌লুম—'বাপ্‌ রে! পূরো দেড় হাত লম্বা! এ দাড়ি কোথায় পেলেন, দাড়িমামা?'

দাড়িমামা বল্‌লেন—'খাস তালুকের মাল,—এই চাঁদমুখখানিরই ফসল। ওর দৌলতেই দাড়িমামার রাজত্ব!'

কথাটা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল্লুম।

বুড়ো বল্‌লেন—'হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে! কাল শুন্‌তে

চেয়েছিলে না—দাড়িমামা-ডাকের আমদানীটা কেন? সম্পর্কে

…গা-ঘেঁসে ব'সে পড়ে…দাড়ি ধ'রে টান দিলুম।—২৬ পৃষ্ঠা

মামা হ'লে কে আর কাকে মাসী ডাকে? আবার দাড়ি থাকলে

মাসীও হ'য়ে যায় দাড়িমামা। হাতে-নাতেই প্রমাণ পেলে তো তার!'

এবার ব্যাপারটা খোলাসা হ'লো। আমি হাতের দাড়িটা নেড়েচেড়ে বল্‌লুম—'তা তো বুঝ্‌লুম। কিন্তু যাত্রার দলের জোয়ান নারদের এই কাঁচা দাড়িটা সত্যিই কি কখনো ঐ মুখে ছিল?'

—'তা না হ'লে পরের ধনে পোদ্দারী ক'রে কি লাভ?... বোসো, ভালো ক'রেই ব'সে তবে শোনো।...হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে না?—নারদের দাড়ি? তাই বটে! নারদের দাড়ির জন্যেই তো যত হাঙ্গামা, আর তার জন্যেই তো দাড়িমামা আজ ভিটেছাড়া ন্যাড়া-মামা।'

দাড়িমামা ন'ড়েচ'ড়ে ঘরের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ব'সে গল্প আরম্ভ কর্‌লেন।

—৫—

'এই যে দেখ্‌ছ দাড়ি, একদিন এইটেই ছিল আমার ভারী সখের জিনিষ; পরে আবার এইটেই হ'য়েছিল মহাজঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জাল হ'লে কি হয়?—সাপের ছুঁচোগেলা দেখেছ তো?—গিল্‌তেও পারে না, ওগ্‌রাতেও পারে না,—এটাকে নিয়েও হয়েছে তাই। গাল থেকে—দূর যাঃ!—ব'লে কবেই ফেলে দিয়েছি, তবু ছাড়্‌তে পারছি কই? আগেরই মত একপোয়া তেল মেখে এখনও এর

তোয়াজ কর্‌তে হয়; আবার যখন সখ হয়, গালে প'রে সঙ্‌ সেজে ব'সে থাকি। কিন্তু ভয় হয় পাছে কেউ পাগল ভাবে,—তাই লুকিয়েই এ-সব কর্‌তে হয়। তুমিও তো আজ পাগলের পাগ্‌লামী খানিকটে দেখেছ। তার ওপর পাগ্‌লামীর কেচ্ছাও শুন্‌তে চাও? বুড়োকে শেষে পাগল ভাব্‌বে না তো, নাত্‌জামাই?'—ব'লেই তিনি হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠ্‌লেন।

আমি বল্‌লুম—'না না, কি বল্‌ছিলেন, বলুন।'

বুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লেন—'শোনো, তবে গোড়ার কথাটাই আগে শোনো।'

'যে-বংশে আমার জন্ম, সে-বংশে চৌদ্দপুরুষ ধ'রে কোনোদিন দাড়িগোঁফের বালাই ছিল না। আমার বাপ ছিলেন আবার আরো এককাঠি উপরে। হপ্তায় দু-দুবার দাড়িগোঁফ চেঁছে ফেলা তো চাই-ই, তার সঙ্গে মাথাটীকেও ন্যাড়া ক'রে মিঠে-কুমড়োটী ক'রে রাখ্‌তেন। আমি ঘরের সবে-ধন নীলমণি, জন্ম হ'তেই আদুরে গোপাল; কিন্তু মাথা-ন্যাড়ার বেলা বাবার কাছে আমার কোনো আব্‌দারই টিকৃত না। বাবার সঙ্গে আমার মাথায়ও হপ্তায় দু-বার নাপিতের ক্ষুর চল্‌তে লাগ্‌ল। বাবা বুড়ো মানুষ, কে আর তাঁকে কি বল্‌বে?—যত তাল পড়্‌ত আমারই তালুতে। আমার ন্যাড়া মাথায় কেউ বুলাত হাত, কেউ মারৃত চাঁটি, আর পাড়ার ছোকরারা দল বেঁধে যে-ছড়া গাইত তা শুনে ইচ্ছা হ'তো নাপিত-

ব্যাটার গালে ক'যে লাগাই তুই থাপ্পড়। তখন বয়স ছিল নেহাৎ কাঁচা, তাই মনের রাগ মনেই থাকৃত চাপা। কিন্তু ছাই-চাপা আগুনের মত সে রাগ মনে থাকায় তখন হ'তেই চ'টে রইলুম কামানোর ওপরে। ভাব্‌লুম—হোক্ আর-একটু বয়স, তখন সুদে-আসলে সব তুলে নিতে ঠেকায় কে, দেখে নেবো।

দেশে সামান্য লেখাপড়া যা হবার হ'লো। তারপর এল বিদেশে যাওয়ার পালা। আমি এই সুযোগই চাইছিলুম। একবার চোখের আড়াল হ'তে পারি তো কার তোয়াক্কা রাখ্‌ব আর? বিদেশে গিয়ে নাপিতকে আমি কাছে ঘেঁস্‌তেও দিলুম না। বছর তুই পরে যখন দেশে ফির্‌লুম, তখন মাথায় আমার মস্ত বাব্‌রি, আর গাল-জোড়া ইয়া গালপাট্টা।

বাড়ীতে ঢুকে বাবাকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—কে রে?

পরিচয়ের আর দরকার হ'লো না। বাবা বল্‌লেন—যে-দেশে তুমি ছিলে সেখানে নাপিতের অভাব আছে ব'লে তো শুনিনি। আর আমাদের এমন কোনো অশুচও পড়েনি যাতে চুলদাড়ি রাখ্‌তে হয়েছে।...ভালো, দাঁড়াও এখানে,—এখনই আমি নাপিত ডেকে আন্‌ছি।—ব'লেই বাবা সত্যিসত্যিই নাপিত ডাক্‌তে ছুট্‌লেন।

নাপিত এসে আমার দিকে এগোতেই আমি কট্‌মট্‌ ক'রে

তার দিকে এমন ভাবে চাইলুম যার কাছে কোথায় লাগে

মুখের ধমক—খবরদার! নাপিত ভয়ে ভয়ে দশ পা পিছিয়ে গেল। বাবা বল্‌লেন—কি ব্যাপার? নাপিত ইয়ে ইয়ে ক'রে মাথা চুল্‌কোতে লাগ্‌ল। আমি স্পষ্টই ব'লে ফেল্‌লুম—আমি চুলদাড়ি ফেল্‌ব না।

জ্বলন্ত উনুনে খড় দিলে যেমন দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠে,

বাবার চোখেও তেম্‌নি আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল। তিনি মুখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর চ'লে যেতে যেতে বল্‌লেন—তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে। তুই আমার ত্যাজ্য পুত্তুর।

কিন্তু ত্যাজ্য পুত্তুর মুখে বল্‌লেই কি হ'লো?—ত্যাজ্য পুত্তুর হয় কে? আমি গ্যাঁট্ হ'য়ে বাড়ীতেই চেপে বস্‌লুম। তার ওপর বাবাকে মুখ দেখানোও তো চাই, তাই তাঁর চোখের পরে ব'সে দিনের পর দিন দু-ঘণ্টা ধ'রে দাড়িতে তেল মাখাতুম।

আমার কাণ্ড দেখে বাবার মুখে রা সর্‌ল না। তিনি ছিলেন জেদী লোক। নিজের জেদে নিজেই শেষে শিষ্যবাড়ী যাওয়ার নাম ক'রে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেলেন।

আমার ওপর রাগ ক'রে বাবা সেই যে গেলেন, আর ফির্‌লেন না। দু-মাস পরে বিদেশ থেকে খবর এল তিনি মারা গিয়েছেন।

দাড়ির দেমাকে তখনও আমি বেপরোয়া। ওরই জন্যে কেউ ডাকে আমাকে দাড়িদাদা, কেউ বলে দাড়িকাকা, আর যার ভিটেয় এখন আছি সেই ভাগ্‌নীরও হলুম দাড়িমামা। ওর দাম তাই আমার কাছে রাজমুকুটেরই সামিল। বাবার শ্রাদ্ধের সময়ও দাড়ি ফেল্‌তে আমি রাজী হলুম না। সবাই—ছিঃ! ছিঃ!—কর্‌তে লাগ্‌ল; জ্ঞাতিগোষ্ঠী আমার বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল; তারপর সবাই মিলে আমাকে একঘরে ক'রে রাখ্‌ল। আমি তাদের মুখের

কাছে দু-হাতের বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে দেশ ছেড়ে গিয়ে শ্বশুর-বাড়ীতে আড্ডা গাড়্লুম।

আমার বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায়ই। তারপর ছেলেও হয়েছিল একটী। আমিও যেমন বাপমায়ের এক ছেলে, সে-ও ছিল তেম্নি। কাজেই মায়ের কাছে এই শিবরাত্তিরের সলতেটীর আদরের সীমা ছিল না। তার আদরের ফলে ছেলে যেমন হ'লো আকাট গোঁয়ার তেম্নি হ'লো বিশ্ব-বকাটে। রাজ্যের যত বদ্‌ছেলে তার ইয়ার,—তাদের নিয়েই তার আড্ডা। আমি কিছু বল্‌তে গেলে মায়ে-পোয়ে একসঙ্গে গলা মিশিয়ে এমন ষাঁড়ের চ্যাঁচানি জুড়ে দিত যে পাড়ার লোকের ঘরে টেকা দায় হ'তো। এই ছেলেই হ'লো আমার কাল। তার কীর্ত্তি-কথাই শোনো এখন, বল্‌ছি।

একদিন পাশের গ্রামে এক কাজের বরাত ছিল, তাই সেরে রাত্রে বাড়ী ফির্‌ছি। ঘুট্‌ঘুটে আঁধার পথে পা টিপে টিপে চল্‌তে হচ্ছে। হঠাৎ কাছে শব্দ হ'লো যেন ছাগল ডাক্‌ছে। অবাক্ হ'য়ে আমি থেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, পেছনদিক হ'তে কে এসে আমার কাঁধের ওপর ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌ল—কি চাঁদ! ছাগল খুঁজ্‌ছ?—মাংস খাবে? খাও না! ফ্যালো কড়ি, নাও ছাগলের বাচ্ছা! তার কথা শেষ হ'তে না-হ'তেই হুড়মুড় ক'রে আর-একদল কারা—যেন রাস্তা ফুঁড়েই বেরিয়ে এসে

—আমার ঘাড়ে পড়্ল। তারাও সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠ্ল—কি রে, পট্লা, কি, কি? পট্লা আগেকার সেই লোকটারই নাম হবে। সে বল্ল—ছাগলের খদ্দের জুটেছে রে—এই দ্যাখ্ না—ব'লেই ঠাস্ ক'রে আর-এক চড় বসিয়ে দিল আমার পিঠে। এ-পর্য্যন্ত আমি মুখখোলারও সুযোগ পাইনি, ভ্যাবাচাকা খেয়ে শুধু ভাব্ছিলুম—এরা কারা? আমার কাছে চায়ই বা কি? পিঠে চড় খেয়ে যাই ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়েছি, অম্‌নি কে-একজন আঙ্গুল দিয়ে আমার দাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বল্ল—ছাগলের খদ্দের ধরেছিস্ তো ভালোই!—এ নিজেই যে রামছাগল্! দেখছিস্ না—মুখে দাড়ি! দেখ্তে না-দেখ্তে অম্‌নি দু-তিন জোড়া হাত আমার গালে এসে ঠেক্ল। তার মধ্যে একজন দাড়িটা ধ'রে আচ্ছা ক'রে ঝাঁকানি দিতে লাগ্ল। আর-একজন বল্ল—দেশ্‌লাইটা জ্বাল্ না, দে দাড়িতে আগুন ধরিয়ে! ফস্ ক'রে দেশ্‌লাইর কাঠি জ্ব'লে উঠ্ল। আলোতে সাম্‌নের দিকে চেয়ে আমি যেন ভূত দেখে আঁৎকে উঠ্লুম। সেই দলের মধ্যে আগেই চোখে পড়্ল আমার গুণধর পুত্তুরের মুখখানি! আমার মুখ দেখে ছেলেরও হয় তো চমক লেগে থাক্‌বে। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্ল—আরে সর্ব্বনাশ! বাবা যে!—ব'লেই পট্‌লাকে ঠেলা দিয়ে বল্ল—পালা, পালা, বড্ড ভুল হ'য়ে গ্যাছে। হুড়মুড় ক'রে ছেলে আর তার ইয়ারের দল আঁধার পথে আবার মিশে গেল।

পথে চল্‌তে চল্‌তে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল—এ দাড়ি দেশ্‌লাইর আগুনেই জ্ব'লে গেল না কেন!

কিন্তু পোড়ার মায়া!—পরের দিনও আগেরই মত সে

···একজন দাড়িটা ধ'রে···ঝাঁকানি দিতে লাগ্‌ল।—৩৪ পৃষ্ঠা

দাড়িতে তেল মাখাতে লাগ্‌লুম। আর ছেলের নাওয়া-খাওয়ার বরাদ্দও রইলো আগেরই মত বাড়ীতে।

এরপর আর-একদিন আর-এক কাণ্ড ঘট্‌ল—প্রায় বছর খানেক পরে।

ছেলে আর তার ইয়াররা মিলে সখের এক যাত্রার দল খুলেছে।

কিন্তু ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার যেমন, সে দলেরও সেই দশা। কোথায় বাজনা কোথায় গান কোথায়ই বা সাজ—কিচ্ছুরই জোগাড় নেই! তাই বাবাজীরা রোজই ফিকিরে ফেরে—যার যার ঘর হাত্‌ড়ে যা জোটাতে পারে।

একদিন খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা শুয়ে আছি। গরমে তেমন ঘুম হচ্ছে না। হঠাং ঘরের পেছনে চাপা-গলার আওয়াজ পেলুম। চুপে চুপে উঠে বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে আসূল ছেলের আর তার ইয়ারদের কথা। একজন আর-একজনকে বল্‌ছিল—নারদের দাড়ি! তার জন্য আবার ভাবনা কি! একখানা কাঁচি হ'লেই হ'লো। যা যা, সে ভার আমার। শুনে আমার সন্দেহ হ'লো—বটে! হতচ্ছাড়ারা শেষে আমার দাড়িতেই কাঁচি চালাবে নাকি!

যে-সন্দেহ তখন হয়েছিল কয়েকদিন পরে ঘট্‌লও তাই। একদিন রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। ঘুমের ঘোরে যেন মনে হ'লো গালের কাছে ঘ্যাচ্‌ ঘ্যাচ্‌ ক'রে কি চল্‌ছে। ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে হাত বাড়াতেই কার একখানা হাত হাতে ঠেক্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে মাটিতে কি প'ড়ে গেল। তারপর যা নজরে পড়্‌ল, তা দেখে চোখ আমার চড়কগাছ! যাত্রার দলের নারদের দাড়ি আমার গাল থেকেই জোগাড় হচ্ছিল, আর তা জোগাড় করছিল যারা তাদের দলে ছিল আমার নিজেরও ছেলে!

এরপরে সে দাড়ি রাখা ঝঞ্ঝাট বাড়ানো বই তো নয়! তার ওপর কাঁচির পোঁচে খানিকটে দাড়ি কেটেও গিয়েছিল। পরদিন ভোরেই আমি নাপিত ডেকে মুখখানিকে একদম সাফ ক'রে ফেল্‌লুম।

ঠিক সেই সময় ভাগ্‌নীর বাড়ীরও ডাক এল। ছেলে নিজের

···যা নজরে পড়্‌ল, তা দেখে চোখ আমার চড়কগাছ!—৩৬

পথ নিজেই কর্‌ছে, তার জন্যে আমার আর ভাবনা কি! তাই তল্‌পী-তল্‌পা গুটিয়ে নিয়ে এই দেশে এসেই ঠাঁই নিলুম।'

কথা বল্‌তে বল্‌তে বুড়ো হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলেন। একটু থেমে

দম নিয়ে ধীরে ধীরে আবার বল্‌লেন—'কিন্তু, এই দাড়ি,—যার জন্যে বাপের তোয়াক্কা রাখিনি,—ছেলের ভয়ে তা কেটেছি ব'লে কি ফেলে দিতে পারি! তাই যত্ন ক'রে সঙ্গেই নিয়ে এলুম, আর যত্ন ক'রে বাঁধিয়েও রেখে দিয়েছি কাছে কাছে—লুকিয়ে। এ ছাড়া আর-এক ভয়ও আছে,—কি জানি, এ-গালের ওপর শ্রীমানদের আবার নজর পড়ে—তাই রসুন-তেল ঘ'ষে ঘ'ষে মাকুন্দো হ'য়ে আছি—একগাছি দাড়ির চিহ্নও যেন এ-মুখে আর না থাকে।' কথা শেষ ক'রে বুড়ো দাড়িটার দিকে চোখ রেখে নিজের গালে হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ ব'সে রইলুম। পরে আমিই প্রশ্ন করলুম—'সে ছেলে আপনার এখন কোথায়?···আর, তার মা?'

আঙ্গুল দিয়ে উপরের দিক দেখিয়ে দিয়ে বুড়ো বল্‌লেন—'মা গ্যাছেন স্বর্গে। তাঁর ল্যাঠা চুকেছিল অনেকদিন আগেই। আর ছেলে গ্যাছে যেখানে তার জায়গা—গোল্লায়।' একটু চুপ ক'রে থেকে আবার তিনি বল্‌লেন—'আছে, বেঁচেই আছে। অমন কুলাঙ্গার কি সহজে মরে!'

—৬—

ছ-মাস বাদে মাসীমার ননদের বিয়েয় ফের মাসীর বাড়ীতে যাচ্ছি, পথেই ভণ্ডুলের সঙ্গে দেখা।

বল্‌লুম—'ভণ্ডুল যে! কি খবর? কেমন আছ?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'ভালোই আছি। কখন এলেন আপনি?'

আমি বল্‌লুম—'এই তো। এসো একবার বিকেলের দিকে—তোমাদের পাড়ায় বেড়াতে যাব, আর দেখেও আসব দাড়িমামাকে একবার।'

ভণ্ডুল আমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্‌ল—'দাড়িমামা তো নেই।'

—'কোথায় গেলেন?'

—'ম'রে গ্যাছেন।'

'এ্যাঃ!'—কথাটা শুনে বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লুম—'এই তো সেদিন তাঁকে দেখে গেলুম। এরি মধ্যে মারা গেলেন! কি হয়েছিল তাঁর?'

ভণ্ডুল বল্‌ল—'জ্বরবিকার। সে কি চ্যাঁচানি!—যদি শুন্‌তেন! প্রায়ই বল্‌তেন—দাড়ি, ওটা আমার দাড়ি। কখনো বল্‌তেন—বাবা, তোমার অপমানের শোধ দিয়েছে তোমার নাতি। উপযুক্ত প্রাচিত্তিই হয়েছে। কখনো চেঁচিয়ে উঠ্‌তেন—ওরে হতভাগা, নারদের দাড়ি কি কাঁচা হয়! বলুন তো এ সব কি! আর-একটা মজার ব্যাপার জানেন!—বুড়ো মারা যাওয়ার পরদিন কোত্থেকে একটা লোক এসে হাজির হ'লো। সবাই বল্‌ল—সে দাড়িমামারই ছেলে। ঘরের জিনিষপত্র যা ছিল সে ছুঁইলও না; খুঁজে খুঁজে বের

করল একটা দাড়ি—যেমন লম্বা তেমনি কালো। সেই দাড়ি

হাতে নিয়ে বলল—বেড়ে হবে। তারপর সে যে কোথায় ছুট্ দিল তার পাত্তাও নেই।'

ভণ্ডুলের কথা শুনে আমি মনে মনে না ভেবে থাকতে পারলুম না—চিত্রগুপ্তের নিক্তির মাপ, এই রকমই কাঁটায় কাঁটায় চলে! মুখে বললুম—'আহা, বেচারা মরার সময়ও এত কষ্ট পেয়ে গেলেন! তা যাকগে, তুমি এসো একবার বিকেলে। দাড়িমামার নয় শেষ-দেখা একবার দেখে আসব।'

ষষ্ঠীচরণ দস্তিদার সরকারী ছোট্ট-ঠাকুরদা,
পালোয়ান সে হ'তে গেলো মামার বাড়ী মাকড়্দা।
ফির্লো যখন বড়াই করে সবাইর কাছে দিনরাত—
'কব্জীতে যা জোর হয়েছে, ভ্যাখ্ না দিয়ে হাতে হাত!'

দুষ্টু ছেলে বঙ্কু বলে—'ছোট্ট-ঠাকুদ্দা কি যে কন!
পালোয়ানের কদর বোঝে পাড়ায় আছে কেউ এমন?
খেল্ দেখিয়ে সুখটী হবে যান চ'লে যান আলিপুর,
উটের পেটে চালান ঘুষি, ঘুরান ধ'রে হাঁতীর শুঁড়!'

ষষ্ঠী বলে—'ঠিক বলেছিস্। চল্, বাবা, তুই চল্ সাথে।
নিজের চোখে দেখ্‌তে পাবি ক্যায়সা খেলি এই হাতে!'

দাঁতাল হাতী একটা ছিল চিড়িয়াখানার একদিকে,
আলিপুরে ষষ্ঠী গিয়ে দেখ্‌লো আগে সেইটীকে।
দূর থেকে এক ঘুষি তুলে কয় সে—'ব্যাটা, শুঁড় বাড়া।
চর্কী-ঘোরার একটী পাকে ভেঙ্গে দি তোর শিরদাঁড়া!'
বঙ্কু বলে—'বলেন কি ও? তার চেয়ে এক কাজ করুন—
গোটা দুয়েক আনুন কলা, হাতীর কাছে তাই নাড়ুন!'
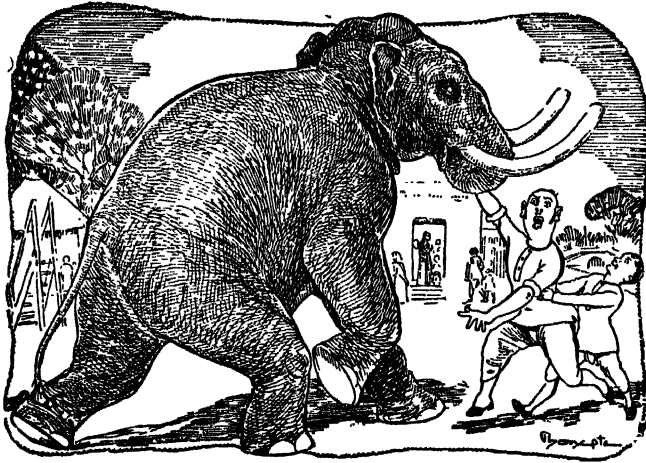
ষষ্ঠী নিয়ে মুঠোয় কলা হাতীর কাছে নাড়ায় হাত।
হা—র্—রো ক'রে শুঁড়টী তুলে দাঁতাল হাতী দেখায় দাঁত।

হ্যাচ্‌কা টানে কলার সাথে হাতটী নিয়ে দেয় মুখে।
চোখদুটো হয় ছানাবড়া, ষষ্ঠী বলে বন্ধুকে—
'ধর্‌, বাবা, ধর্‌, গেলুম গেলুম, হাত যে আমার গেলো রে!
কলার সাথে হাতীর পো মোর হাতখানিও খেলো রে!'

বন্ধু টানে পেছন দিকে সামনে লাগে হাতীর টান।
কলার সাথে হাতীর গলায় হাত ঢুকে যে বেরোয় প্রাণ!

হাতের কলা ছেড়ে তখন ষষ্ঠীচরণ পেলো ছাড়।
বন্ধু কোথা?—পায় কে ডেকে, একছুটে সে পগার পার!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা অন্যান্য বই

—ছোটদের জন্য—

সাবিত্রী···৷৹

ফুলঝুরি···৷৹

টুলটুল···।৵৹

জয়ডঙ্কা···।৵৹

ময়ুরপঙ্খী···৷৹

চরকা-বুড়ী···৷৹

তাই তাই······৷৵৹

পাঁচমিশালী গল্প···৷৹

তেপান্তরের মাঠ···৷৹

সাতরাজ্যের গল্প···৷৹

আগডুম বাগডুম···।৵৹

এবেলা-ওবেলার গল্প···৷৹

গোপাল ভাঁড়ের গল্প···৷৹

সোনার কাঠি রূপার কাঠি···৷৹

তেরাত্তিরের তাইরে-নাইরে-না···৷৹

—বড়দের জন্য—

লিসিদাস···৵৹

মালঞ্চের ফুল···১৲

বিষের হাওয়া···১।৹

হিমালয়ের হিমতীর্থে···১৲